চিরন্তনী মা

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আবহমানকাল থেকেই ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা এদেশের মূল জীবনীশক্তি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখনই ধর্মক্ষেত্রে আবিলতা এসেছে, তখনই শ্রীভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন। গীতামুখে তিনি কথা দিয়েছেন—'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' পৌরাণিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কালক্রম লক্ষ করলে দেখা যায়, শ্রীভগবানের সেকথার ব্যত্যয় ঘটেনি কখনও। সব যুগেই উপযোগী ধর্মসংস্থাপনের জন্য তাঁর দিব্য আবির্ভাব সমৃদ্ধি ও পুষ্টি জুগিয়েছে শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের চিন্তায় ও মননে। কর্মধারাতেও তার প্রতিফলন জনজীবনকে ক্রমশ উন্নত করেছে। এযুগেও শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব সেই কারণেই। জীবের প্রতি শ্রীভগবানের এই অহেতুক করুণা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন, পরব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ। আরও বলেন, তিনি 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ অরসম্ অনিত্যম্ অগন্ধবৎ।' অর্থাৎ তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রশ্ন জাগে, যিনি বিষয়ের সঙ্গে সংস্পর্শশূন্য, তিনি কীভাবে জীবের আনন্দ-বেদনায় সংবেদনশীল হবেন? আচার্য শংকর তাঁর 'আনন্দলহরী'তে এর ব্যাখ্যা করেছেন : ''শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।/ নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।''—শিব শক্তিযুক্ত হলে তবেই সৃষ্টিসমর্থ হন। নতুবা তাঁর স্পন্দনেরও সামর্থ্য থাকে না, তিনি তখন শবরূপে পরিণত হন। অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই সেই জড়বৎ প্রতীত পরব্রহ্ম সৃষ্টিতে সক্ষম হন।

ঊনবিংশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃখ-দৈন্য-হতাশাগ্রস্ত সমাজচিত্র ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল। ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতির সীমা ছিল না। তারই ফলে দেখা দিল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবনমন। নিজেদের শাশ্বত, মহিমান্বিত, গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে ভারতবাসী মেতে উঠল সদ্য আগত আপাতবর্ণময় ইউরোপীয় ভাবধারার অনুকরণে। অন্যদিকে, বেশ কিছু বোধসম্পন্ন মানুষ ছিলেন এর বিপরীতে। এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাব-দ্বন্দ্ব তখন এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি করেছিল। অধিকাংশ মানুষ নিজের মূল্যবোধ—যা তার আত্মপরিচয়ের প্রথম ও প্রধান সোপান—তা ভুলতে বসেছিল।

মূল্যবোধের প্রথম বিকাশ ঘটে বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে। পরিবারই সমাজসৌধের ভিত্তি। তাই দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের মহান দায় বহন করে পরিবার। পারিবারিক বুনিয়াদ তাই দৃঢ় হওয়া একান্ত আবশ্যক। শুভসংস্কারসমৃদ্ধ পরিবারেই মানুষের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটে বেশি। 'আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী' মানুষ গড়ে ওঠে এই পরিবারেই। নানান ঘাত-প্রতিঘাতে ঊনবিংশ শতকের সমাজে এই পারিবারিক ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়েছিল। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল তাকে দৃঢ়সংবদ্ধ করার।

পরিবারকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দায় গৃহিণীর ওপরেই ন্যস্ত থাকে। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' গৃহকে আদর্শ গৃহ করে তুলতে পারেন তিনিই। প্রাচীন ভারতে এই গৃহস্থধর্ম উচ্চসুরে বাঁধা ছিল। মনুসংহিতা বলেছেন, ''যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।/ তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বে আশ্রমাঃ॥''—বায়ুর আশ্রয়ে যেমন সমস্ত জীব জীবনধারণ করে তেমনই গৃহস্থধর্মকে আশ্রয় করে থাকে সব আশ্রম। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারটি আশ্রমেরই ধারক ও বাহক গার্হস্থ্যধর্ম। কেননা, এই আশ্রম চতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও পোষণ দুয়েরই মূলে আছে গৃহ। অতীতে গার্হস্থ্যধর্ম ছিল অধ্যাত্মভাবরসে জারিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাই যাজ্ঞবল্ক্যকে বলতে শোনা যায়, ''ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি।'' পতি-পত্নীর মধ্যে যে-আকর্ষণ, তা মূলত উভয়ের মধ্যে যে-আত্মা বা ঈশ্বর আছেন তাঁর প্রতি আকর্ষণের জন্যই। এমন সুন্দর ভাব কেবলমাত্র এদেশেই সম্ভব। পতি-পত্নীর এই দেহভাববিবর্জিত নিষ্কলুষ সম্পর্কের জন্মদাত্রী ভারত তার এই মহান ভাব বিস্মৃত হতে বসেছিল। তাই একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ভারতের জনমানসে তার হৃত ভাবরাশির পুনরুজ্জীবন ঘটানো। সেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তেই এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী। ত্যাগীর বাদশা হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ সাজলেন গৃহী। ভগবদ্‌ভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করতে ব্যস্ত মা ও ভাইরা যখন সুযোগ্য পাত্রীর সন্ধানে ব্যর্থ, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তাঁর পাত্রীর সন্ধান দিলেন এবং সাগ্রহে বরণ করে নিলেন বিবাহিত জীবন। সে-দেহবোধশূন্য অপূর্ব দাম্পত্যলীলা ছিল সদা আনন্দময়; তা ভাষাতীত, বর্ণনাতীত।

জগতের সকলের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাবের বিকাশ ও পরিপুষ্টির জন্যই তিনি রেখে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। মায়ের জীবনের প্রভাতবেলা থেকেই মাতৃত্ববোধের বিকাশ লক্ষ করা যায়। এই বোধ তাঁর সহজাত। নিতান্ত ছেলেবেলায়, খেলে-বেড়ানোর বয়সে তিনি দরিদ্র পিতামাতার গৃহে সাংসারিক কাজ করেছেন পরিণত বয়সের মানুষের মতো। নিজেই সে-সময়ের কথা বলেছেন, ''ছেলেবেলায় গলা-সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। একবছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল; ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।'' ভাইদের নিয়ে আমোদরে স্নান করতে যেতেন মায়ের মমতায়। সেই নিতান্ত কচিবয়সে প্রয়োজনে রান্নার মতো শ্রমসাধ্য কাজও করেছেন। জননীকে সাহায্য করতে তাঁর দুটি ছোট হাত সবসময় প্রস্তুত থাকত। বহুবছর পরেও তাই কালীমামাকে বলতে শোনা যেত, ''দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিদি কী না করেছেন! ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না-বান্না—বলতে গেলে সংসারের বেশি কাজই তো দিদি করেছেন।''

এগারো বছর বয়সে সারদা দুর্ভিক্ষের সময় পিতার অন্নসত্রে বুভুক্ষু মানুষের পাতের গরম

খিচুড়িতে হাতপাখার বাতাস করেছিলেন পরম মমতায়। কন্যা-ভগিনী-মাতৃরূপে তাঁর এইসব অকাতর সেবা ছিল ক্রমপ্রসরমাণ মাতৃহৃদয়েরই এক অস্ফুট ইঙ্গিত; পরে যা ব্যাপ্ত হয়েছিল সমগ্র বিশ্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে। জগজ্জননীর দিব্যসান্নিধ্যলাভের সুগভীর সাধনায় মগ্ন, তাই সাধারণ লোকব্যবহার মেনে চলতে অপারগ। ফলে জগৎ তাঁকে বিকৃতমস্তিষ্ক আখ্যা দিল। লোকমুখে শুনে সেবা করতে ছুটে এলেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণের সাদর মধুর আপ্যায়নে বিকৃতমস্তিষ্ক নয়, সংসারের আর পাঁচজন স্বামীর তুলনায় নিজের স্বামীকে অনেক বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হল তাঁর। সানন্দে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন সারদা। শুরু হল সেব্য-সেবকের অপার্থিব দাম্পত্যলীলা। স্বামী জানতে চাইলেন, ''কিগো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?'' এতটুকুও সময় না নিয়ে পত্নী জবাব দিলেন, ''না, আমি তোমায় সংসারপথে কেন টানতে যাব? আমি তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।''

প্রায় অশিক্ষিত গ্রাম্য কিশোরীর মুখে এমন কথা অসাধারণ শোনায় বই কী! মন্দিরের ভবতারিণী, গর্ভধারিণী ও সহধর্মিণী—তিনজনে মা আনন্দময়ীরই এক-একটি রূপ—একথা সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু মুখেই বললেন না, আচরণেও দেখালেন। ষোড়শীপূজা করে সারা জীবনের কঠোর সাধনার ফল, জপের মালা পত্নীর রাঙা চরণে নিবেদন করে সেকথার সত্যতা প্রমাণ করলেন। আর ভাবস্থ শ্রীশ্রীমা 'আত্মসংস্থ' পূজারির নিবেদিত সেই পূজা অতিসহজে গ্রহণ করে সেকথার স্বীকৃতি দিলেন! শ্রীশ্রীমা যে কতখানি শক্তির অধিকারিণী ছিলেন, এ-ঘটনাই তার প্রমাণ। শ্রীরামকৃষ্ণের বারো বছরের সব সাধনার ফল আত্মস্থ করতে হলে তাঁরই তুল্য আধার না হলে তা অসম্ভব। কথামৃতকার শ্রীম কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন, ''ঈশ্বর আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন।'' শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য। যথার্থই তিনি ছিলেন 'ভাবাতীত, বাক্যাতীত, জমাটবাঁধা মহাশক্তি।' বাহ্যত এক সরলা পল্লিবালার অন্তরালে যে কী মহাশক্তির উৎস ছিল, তা সহজে বোধগম্য নয়। বলা যায়, তাঁর পুরোটাই 'Unmanifested'। তাই তা সাধারণের বোধের অনেক ঊর্ধ্বে।

রাখাল, নরেন্দ্র সহ অনেকেই তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাঝে মাঝে রাতে থাকতেন। সাধনার প্রথম শর্ত আহারে-বিহারে সংযম। তাই তাঁদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ছেলেদের আহারের পরিমাণ তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু খবর নিয়ে জানতে পারলেন, তাঁর সে-আদেশ আদৌ পালিত হচ্ছে না। এবিষয়ে শ্রীশ্রীমাকে অনুযোগ করলে তাঁর দৃপ্ত উত্তর ছিল, ''ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।'' তাঁর এই সহজাত মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ এবং দায়গ্রহণ শ্রীরামকৃষ্ণকেও সেদিন নীরব করে দিয়েছিল। পাত্র-অপাত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতিই শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাবের এই প্রকাশ দেখা যেত। এক বৃদ্ধা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রায়ই যেতেন। প্রথম জীবনে তাঁর স্বভাব ভাল ছিল না। তাই সদাসতর্ক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে শ্রীশ্রীমাকে নিষেধ করেন। কিন্তু অদোষদর্শী মাতৃকণ্ঠ বলে উঠেছিল, ''ও এখন ভাল কথাই তো কয়, হরিকথা কয়, তাতে দোষ কী?'' আর একবার এক মহিলার স্পর্শ করা খাবার খেতে শ্রীরামকৃষ্ণের কষ্ট হয়। এ-বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য সাবধানবাণী শুনে শ্রীশ্রীমা আবারও তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন—''... আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।'' মাতৃহৃদয়ের এই প্রসারতা দেখাতেই তাঁর আবির্ভাব।

শ্রীশ্রীমা আক্ষরিক অর্থে সন্তানের জননী না হয়েও হয়ে উঠেছেন সমগ্র জগতের মাতা—

'আব্রহ্মকীটজননী।' তাই সরলমনা সন্তান যখন জানতে চান, ''মা, তুমি কি সকলের মা?'' তখন ততোধিক সরল মায়ের উত্তর : ''হ্যাঁ, বাবা।'' এতেও তৃপ্ত না হয়ে সন্তান আবারও প্রশ্ন করেন, ''এইসব জীবজন্তুরও?'' একই উত্তর পেয়ে সন্তানও মায়ের কাছে নিঃসংকোচ। অথচ এই বিশ্বমাতৃত্ব-বোধের বাহ্যিক প্রকাশ এতটুকুও ছিল না। শ্রীশ্রীমায়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাশাহীন বলেই এতটা অন্তর্মুখ, আর সেজন্যই তাঁকে ধরা, বোঝা এত কঠিন।

শ্রীশ্রীমায়ের সংসারের দিকে তাকালে অবাক না হয়ে পারা যায় না। কী নেই সে-পরিবারে! আধপাগল রাধু থেকে শুরু করে পাগলি মামি, শুচিবায়ুগ্রস্ত নলিনী, অর্থলোভী মামারা—সব ধরনের মানুষের এক বিচিত্র সমাবেশ তাঁর সংসার। অথচ তাঁর কাছে সকলেই স্নেহের অধিকারী। কারও প্রতি তাঁর কোনও বিদ্বেষ নেই। যে যেমনই হোক, প্রত্যেকের আশ্রয়স্থল তিনিই। সকলের সব অভাব-অভিযোগ শুনছেন, সেইমতো ব্যবস্থাও করছেন। অথচ তাঁর নিজের কোনও চাহিদা নেই। ভারতের শাশ্বত জননীর এ-রূপ দেখে চোখ সার্থকতা লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব, সেই অপূর্ব স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্যক্ষমাশীলা জননী।'' শ্রীশ্রীমায়ের জীবন এই কথারই বাস্তব রূপায়ণ। স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের এই স্নেহসুধা যথার্থ অনুভব করতে পেরেছিলেন।

জনৈক সন্তান মাত্র কয়েকদিন মাতৃসান্নিধ্য লাভ করে অনুভব করেছিলেন : ''এমন অভাবনীয় ভালবাসা কি নিজের মাও বাসতে পারেন? বাড়ির মাকে তো খুব ভালবাসতাম। তিনিও কত ভালবাসতেন, কিন্তু এ জন্মজন্মান্তরের চিরকালের আপনার মা। মায়ের কথা যা সামান্য শুনেছিলুম, তাতে কে জানত যে মা এমন মা! এরকম করে মনপ্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনার থেকেও আপনার করে নেবেন!''

শ্রীশ্রীমায়ের আশ্চর্য মাতৃত্ব ছিল জগতের সকল মাতৃহৃদয়ের সমষ্টিরূপ। পৃথিবীর সকলকেই আপন করে নেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি সন্তানের অন্তরের চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা—সব হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন। একবার উদ্বোধনে বেশ কয়েকজন দরিদ্র মানুষ গ্রাম থেকে এসেছেন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের প্রত্যাশায়। রুক্ষ, শুষ্ক তাদের বেশভূষা। শ্রীশ্রীমা সেবককে আদেশ করলেন তাঁর কাছে তাদেরকে নিয়ে আসতে। সেবক কিছুটা কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, ''কিন্তু, মা, ওরা যে বড় নোংরা, আর সংখ্যায়ও অনেক।'' একথা শুনে শ্রীশ্রীমা বললেন, ''বাইরেটা ওদের নোংরা কিন্তু ভিতর পরিষ্কার।'' অন্তর্যামিনী মায়ের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে মানুষগুলির বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে প্রকৃত ভক্তসত্তাটিই উন্মোচিত হয়েছে। তাই তিনি তাদের নিজের কাছে আনিয়ে দর্শনদানে পরিতৃপ্ত করলেন।

মাতৃহৃদয়ের এই প্রসারতা শুধু দেশকালের মধ্যেই সীমিত ছিল না। তার পরিধি ব্যাপক। সুদূর আয়ারল্যান্ড থেকে এক দম্পতি ও তাঁদের কন্যা প্রায়ই আসেন ভারতে। কেন যে আসেন তার কারণ তেমন স্পষ্ট নয়, তবু ভারতে আসতে তাঁদের ভাল লাগে। কী যেন অদৃশ্য এক আকর্ষণ বোধ করেন এদেশের প্রতি। একবার তাঁরা উদ্বোধনে গেছেন। সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি দর্শন করে তাঁরা অভিভূত। মহিলার চোখে অবিরল ধারা বয়ে চলেছে। বহুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও সে-ভাবের বিরাম নেই। এদিকে ভোগের দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে বাধ্য হয়েই তাঁদের সরতে বলা হল। তখন তিনি জানালেন, মায়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে আগ্রহী, কেননা এই স্নেহময়ী মায়ের আকর্ষণেই তাঁর এতবার ভারতে আসা। এতদিনে

তিনি তাঁর খোঁজ পেয়েছেন। তাঁকে মায়ের কথা বুঝিয়ে বলে, শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি বই দেওয়া হল। বই হাতে নিয়ে কী আনন্দ তাঁর! ভাবতে অবাক লাগে—কোথায় ভারতবর্ষ, আর কোথায় আয়ারল্যান্ড! মায়ের স্নেহ-ভালবাসার ছোঁয়া সেখানেও পৌঁছে তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সেচন করছে। বিশ্বমাতৃত্বের এ এক অনবদ্য ছবি।

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাকালে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে শ্রীশ্রীমাকে সঙ্ঘজননীরূপে ঘোষণা করেন। কারণ তিনি জানতেন, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে শ্রীশ্রীমায়েরই আন্তরিক প্রার্থনায়। বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ মঠের অতুল ঐশ্বর্য তাঁর কোমল মাতৃহৃদয়কে আরও বেশি ব্যথিত করে তুলেছিল—তাঁর নিজের ত্যাগী সন্তানদের অন্নবস্ত্র-আশ্রয়ের অভাবের কথা ভেবে। কাতরভাবে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ছেলেদের অন্নবস্ত্র-বাসস্থানের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ''... ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠে।'' মায়ের সেই উক্তির প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছিল অপরিসীম স্নেহপূর্ণ সঙ্ঘমাতার এক অপূর্ব ছবি, যিনি সঙ্ঘের সার্বিক মঙ্গলকামনায় একান্ত আগ্রহী। বর্তমানে সঙ্ঘের যে-বিপুল বিস্তার তার মূলে আছে শ্রীমায়ের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহের প্রকাশ যে কতধারে বইত তার ইয়ত্তা নেই। ব্রহ্মচারী রাসবিহারী মহারাজ একদিন বিশেষ কারণে বাইরে গেছেন। ফিরতে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এসে শোনেন মা তখনও খাননি। বিস্মিত হয়ে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে অনুযোগ করেন, ''মা, তোমার শরীর ভাল নয়, আর তুমি এই সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাসী রয়েছ?'' মা শুধু বললেন, ''বাবা, তোমার খাওয়া হয়নি, আমি কী করে খাব?'' এই ছোট্ট একটি বাক্যে এমন প্রাণভরা আন্তরিকতা ছিল যে রাসবিহারী মহারাজ আর কোনও কথা না বলে নীরবে খেতে বসলেন।

এক সন্তান যাচ্ছেন জয়রামবাটীতে, শ্রীশ্রীমাকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে। কিন্তু মনে একরাশ সংকোচ। কী বলবেন? কী করবেন? চেনেন না, জানেন না। মা কি আদৌ তাঁকে দর্শন দেবেন? পৌঁছে দেখলেন, মা কুটনো কুটছেন। দোনামনা করে প্রণাম করতেই মা এক গাল হেসে বললেন, ''কেমন আছ বাবা? পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো?'' ভেঙে গেল সন্তানের সমস্ত সংকোচের আগল। মায়ের স্নেহস্পর্শে এক সপ্তাহ কোথা দিয়ে পরমানন্দে কেটে গেল। প্রথম দিনের ওই একটি সম্বোধনেই মা সন্তানকে উপলব্ধি করিয়ে দিলেন, ''তিনি গর্ভধারিণীর কত উপরে—আসল মা! কিছুর অপেক্ষা রাখেন না, কিছু চান না, অহৈতুকী কৃপা তাঁর, আর কী অপূর্ব ত্যাগ! নিজের কথা এতটুকু ভাবেন না। তাঁর জীবনধারণ—তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসও সন্তানের মঙ্গলের জন্য! সকলের মা তিনি।''

সন্তান মায়ের কাছে সন্ন্যাসের বস্ত্র ও আশীর্বাদ লাভ করে শুনছেন, মা প্রার্থনা করছেন, ''ঠাকুর এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো। পাহাড় পর্বতে বনে জঙ্গলে যেখানে থাকুক না কেন, এদের দুটি খেতে দিও।'' দুর্গম ত্যাগের পথে সন্তানকে অম্লানমুখে ঠেলে দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর স্নেহকোমল মাতৃহৃদয়টি সদাজাগ্রত। তাই সন্ন্যাসিসন্তান চরমবৈরাগ্যের মুহূর্তে জগতের সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলেও সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন, তাঁর একজন মা আছেন যিনি এই ঘোর সংসারে বাস করছেন সন্তানকে সংসারের পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আজ এই বিশ্বজোড়া সংকটমুহূর্তে বিশ্বজননীর কাছে আমাদের প্রাণের প্রার্থনা, তিনি সব বিপদ কাটিয়ে আমাদের মনগুলি তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিন। আমরা এগিয়ে চলি শুভ লক্ষ্যে, শুভ পথে।